বাহাদুর শাহ পার্ক থেকে সূত্রাপুর জমিদার বাড়ি

● শারমিন রেজোওয়ানা

'নাহি পাই নাম এর বেদে কি পুরাণে
কিন্তু বঙ্গ অলঙ্কার তুমি যে তা জানি
পূর্ববঙ্গে। শোভা তুমি এ সুন্দর স্থানে
ফুলবৃন্তে ফুল যথা, রাজাসনে রানী' ---অষ্টাদশ শতকের কোনো এক সময়ে বঙ্গের মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের চোখে তিলোত্তমা ঢাকা এভাবেই ধরা দিয়েছিল। আজ ২০১৪ সালে এসে ঢাকার সেই রূপের কোনো কিছুই আর অবশিষ্ট নেই বললে চলে। নতুন শহরের ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণে অতীতের অনেক কীর্তি আজ অবলুপ্ত। সময়ের নিষ্ঠুর থাবায় পুরান ঢাকার অনেক স্মৃতিচিহ্ন হারিয়ে গেছে, জরাজীর্ণ দালানগুলো গেছে ভেঙে। কিন্তু এই ঐতিহ্যবাহী নগরী সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ এবং কৌতূহল এখনো সবুজ। একদিন বেরিয়ে পড়লাম 'পুরান ঢাকা' দর্শনে।

আমাদের যাত্রা শুরু হলো জনসন রোডে অবস্থিত 'বাহাদুর শাহ' পার্ক থেকে। কাগজপত্রে নাম 'বাহাদুর শাহ' পার্ক হলেও বেশিরভাগ মানুষই একে এখনো ভিক্টোরিয়া পার্ক নামেই চেনে! তবে প্রবীণদের কাছে কিন্তু বাহাদুর শাহ পার্ক বা ভিক্টোরিয়া পার্ক নয়, সবুজে ঘেরা এই খোলামেলা পার্কটি পরিচিত 'আন্টাঘর ময়দান' নামে। ১৮ শতকের শেষ ভাগে এখানে আর্মেনীয়দের একটা ক্লাব ছিল, তারা সেখানে বিলিয়ার্ড খেলত। বিলিয়ার্ডের সাদা গোল বলগুলো ডিমের মতো দেখতে– যা কিনা স্থানীয় বাঙালিদের চোখে ছিল অদ্ভুত রকমের 'ডিম'– যা আবার লাঠি দিয়ে ঠেলে খেলতে হয়! সুতরাং তারা এই ক্লাবের নাম দিল 'আণ্ডাঘর'! আণ্ডাঘর ধীরে ধীরে অপভ্রংশ হয়ে উচ্চারিত হয় 'আন্টাঘর' নামে! পরবর্তীকালে আর্মেনীয়দের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়লে তারা ক্লাবটি বিক্রি করে দেয় ইংরেজদের কাছে। ইংরেজরা ক্লাব ঘরটি ভেঙে ফেলে একে খোলা মাঠ বানিয়ে ফেলে।

বাহাদুর শাহ পার্কের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক করুণ কাহিনী। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের সময় ঢাকায় ধরা পড়া বিদ্রোহীদের এবং তাদের সঙ্গে সিপাহিদের উৎসাহ ও সাহায্য করার অভিযোগে শত শত নিরীহ সাধারণ মানুষকে এই মাঠের সারিবদ্ধ পাম গাছে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল! এখন অবশ্য সেই পুরনো পাম গাছগুলোর কোনোটাই আর অবশিষ্ট নেই। পার্কের ভেতরে এখন সকাল-বিকাল স্বাস্থ্যসচেতন মানুষের সমাগম হয়। পার্কের পূর্বদিকে রয়েছে লালচে মার্বেল পাথরের একটি বেশ উঁচু সৌধ। এটি ঢাকার নবাব আবদুল গনির নাতি খাজা আফিজুল্লাহর। সৌধের উৎকীর্ণ ফলকের তথ্য অনুযায়ী, ১৮৮৪ সালে খাজা আফিজুল্লাহ মারা যান, তখন তার ইউরোপীয় বন্ধুরা চাঁদা তুলে সৌধটি নির্মাণ করেছিলেন। এর উল্টোপাশে আছে আরেকটি স্মৃতিসৌধ, সেটা ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহে শহীদ হওয়া সিপাহিদের স্মৃতিতে বানানো হয়েছিল।

বাহাদুর শাহ পার্ক থেকে জনসন রোড ধরে সামনের দিকে একটু এগোলেই পড়বে সেন্ট থমাস চার্চ। দূর থেকেই এর চূড়াটা দেখা যায়। এক সময় এই চার্চের মাথায় শোভা পেয়েছিল ঢাকার একমাত্র 'বিগবেন' ঘড়ি। বাংলার প্রাচীনতম চার্চগুলোর মধ্যে অন্যতম সেন্ট থমাস চার্চ নির্মিত হয়েছে ১৯১৯ সালে। শুনলে হয়তো অনেকে অবাক হবেন যে, এই চার্চের নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজে লাগানো হয়েছিল ঢাকা জেলের কয়েদিদের।

চার্চ থেকে বেরিয়ে রাস্তা পার হয়ে লক্ষীবাজারের পথ ধরে আরো কিছুদূর হেঁটে আমরা পেয়ে গেলাম ঢাকার প্রাচীনতম স্কুলগুলোর একটি– 'পোগোজ স্কুল'। যদিও কাগজে-কলমে বিখ্যাত পোগোজ স্কুলের ঠিকানায় রাস্তার নাম 'চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ' লেখা থাকে, তবে আজকাল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় দক্ষিণপাশে একটি ফটক আর উত্তরপাশে দেয়াল তুলে রাস্তাটা দখল করে নিয়েছে, তাই 'চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ' নামের কোনো রাস্তা এখন আর বাস্তবিকভাবে নেই, একটি জলজ্যান্ত রাস্তা গায়েব হয়ে গেছে। ১৮৪৬ সালের দিকে একবার ঢাকা কলেজের ৯৬ ছাত্রকে কলেজ থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল বেতন পরিশোধ করার সামর্থ্য না থাকায়। এ ঘটনা ঢাকার সিভিল সার্জন এবং ঢাকা কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র টি এ ওয়াইজের মনে খুব আলোড়ন তোলে। তিনি এই দরিদ্র ছাত্রদের জন্য 'ইউনিয়ন স্কুল' নামে আলাদা একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তবে অর্থের অভাবে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এটা চালানো তার পক্ষে দুরূহ হয়ে ওঠে। তখন নিকোলাস পোগোজ নামের একজন ধনী আর্মেনীয় স্কুলটি চালানোর ভার নেন। তিনি নিজের বাসভবনেই 'পোগোজ অ্যাংলো ভার্নাকুলার স্কুল অব ঢাকা' নামে স্কুল কার্যক্রম চালাতে থাকেন। ১৮৭৮ সাল, নিকোলাস পোগোজ কী কারণে লন্ডন চলে যান। তারপর স্কুলটির মালিকানা পেলেন তৎকালীন ঢাকার বিশিষ্ট ব্যাংকার ও 'সবজি বাগানের' জমিদার মোহিনিমোহন দাস। উদার মানুষ বলেই স্কুলটির সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত করেননি মোহিনিমোহন। কাজেই বেঁচে রইলেন নিকোলাস পোগোজ। দারুণ নাম ছড়িয়েছিল ঢাকার নিকি পোগোজের স্কুল। যে কারণে স্বামী বিবেকানন্দ, মাইকেল মধুসূদন দত্তের মতো মানুষ স্কুলটি দেখতে এসেছিলেন।

পোগোজ স্কুল থেকে এখন আমরা শাঁখারীবাজারের সংকীর্ণ রাস্তায় হাঁটছি, তবে এখানকার প্রাচীন বাড়িগুলো এখন আর নেই বললেই চলে। বর্তমানে এখানে যদিও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ঘোষিত ১৪২টি সংরক্ষিত ভবন থাকার কথা, তবে নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই সংরক্ষিত ভবনগুলো ভেঙে বহুতল অট্টালিকা বানানো হচ্ছে। আমরা ১৪ নম্বর বাড়িটির নিধনযজ্ঞের চিহ্ন দেখে এলাম!

শাঁখারীবাজারের রাস্তার দু-পাশের বাড়িগুলোর নিচের তলায় শাঁখার, নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র এবং খাবারের দোকান! মাঝে মাঝেই ফুলওয়ালীরা রাস্তার দু-পাশে রক্তবর্ণা জবা ফুলের বড় বড় মালা এবং টগর আর আলকানন্দার পসরা সাজিয়ে বসেন। সকালবেলা বলেই হয়তো রাস্তায় ভিড় বেশ কম, শাঁখার দোকানগুলো একটা-দুটা করে খুলছে, মাঝে মাঝে জয়কালী মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসছে। শাঁখারীবাজারের আসল রূপ আস্বাদন করতে হলে আপনাকে চোখ-কান এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় সব একসঙ্গে কাজে লাগাতে হবে। আধুনিক বাড়ির মাঝে মাঝে ঘাড় গুঁজে কোনোমতে দাঁড়িয়ে থাকা পুরনো অট্টালিকা, বাড়ির সামনে সনাতনি ধাঁচের সোনার গয়না পরা মাসিমাদের হাত নেড়ে নেড়ে গল্প করা, মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনির

সঙ্গে ধূপ-ধুনো-ফুলের গন্ধ মিলে এমন একটা আবহ, যেটা আপনি বোধকরি আর কোথাও খুঁজে পাবেন না। শাঁখারীবাজার হেঁটে পার হয়ে ডানে মোড় নিয়ে ইসলামপুর রোড ধরে কিছুটা সামনে এগোতেই এসে পড়লাম মুঘল আমলে গড়ে ওঠা পাটুয়াটুলীতে।

এক সময় পায়জামার দড়ি, ফিতা, টাকা রাখার থলে বা গেছিয়া বানানোর কারিগরদের পূর্ববাংলায় পাটিয়া বা পটুয়া বলত, আবার যারা পটে ছবি আঁকে তারাও পটুয়া। এসব পটুয়ার নাম থেকেই এলাকাটির নাম হয়েছিল পাটুয়াটুলী। ব্রিটিশ আমলে পাটুয়াটুলী ছিল ঢাকার সম্ভ্রান্ত লোকদের বিপণিকেন্দ্র। এই রাস্তায় রয়েছে বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'সওগাত' ও 'বেগম' পত্রিকার প্রথম কার্যালয়, ব্রাহ্ম সমাজ মন্দির এবং ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত রাজা রামমোহন লাইব্রেরি। ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরের কম্পাউন্ডেই রয়েছে রাজা রামমোহন লাইব্রেরি, যার বর্তমান ভবনটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ঢাকা ভ্রমণে এসেছিলেন, তখন তিনি তার কিছু বই এই লাইব্রেরিকে দান করেছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরের অদ্ভুত সুন্দর কারুকাজ করা কাঠের দরজাটি দর্শকদের জন্য অবশ্যদ্রষ্টব্য।

পাটুয়াটুলী থেকে বের হয়ে জনসন রোড ধরে পূর্বদিকে সামান্য দূরত্বে রয়েছে ঢাকার প্রাচীন দুটি শিক্ষালয়– ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। সদলে গেলাম আমরা সেখানে, যেখান থেকে বঙ্গভঙ্গের সময় সুরেন্দ্রনাথ ঢাকাবাসীর উদ্দেশে তার বক্তৃতা দিয়েছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম বাংলাদেশে এসে বাণী প্রচার করেছিলেন, সেই জগন্নাথ কলেজ (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়) দেখতে। বালিয়াটির জমিদার কিশোরীলালের পিতা জগন্নাথ সাহা রায়চৌধুরীর নাম অনুসারে রাখা জগন্নাথ কলেজ সম্পর্কে একবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ গিরিশ নাথ লিখেছিলেন, 'গরিব পশ্চাৎপদ জনসংখ্যার হাতের নাগালের মধ্যে বিদ্যাকে এনে দিয়ে জগন্নাথ কলেজ পূর্ববাংলার সামাজিক বিপ্লবের সূচনা করেছিল!'

সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারস গার্লস হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯১২ সালে। পাশেই রয়েছে ১৮৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হলিক্রস চার্চ। হেঁটে যখন আমরা সেখানে উপস্থিত হলাম দেখি চার্চের সদর দরজা বন্ধ। এতদূর এসে চার্চটা দেখা হবে না ভেবে আমরা কিঞ্চিৎ হতাশ, গেটের ফাঁক দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছি। ঠিক তখন আমাদের ট্যুর প্রধান সাজ্জাদ ভাই একটি বিকল্প রাস্তা খুঁজে বের করলেন। পাশের নির্মাণাধীন ভবনের ফাঁক গলে পেছন দিয়ে আমরা পা রাখলাম হলিক্রস চার্চের একদম ভেতরে। হলিক্রস চার্চ দেখা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পদব্রজে যাত্রা আপাতত শেষ। এবার আমরা যাব ফরাশগঞ্জের বিখ্যাত 'লালকুঠি' বা 'নর্থব্রুক হল' দেখতে। লক্ষ্মীবাজার থেকে রিকশায় মিনিট দশেক সময় লাগল বুড়িগঙ্গার ধার ঘেঁষে গড়ে ওঠা ফরাশগঞ্জে অবস্থিত নর্থব্রুক হলে যেতে। এই হলটি নির্মিত হয়েছিল তৎকালীন ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুকের ঢাকা সফরকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এবং তার নামেই এর নামকরণ করা হয়েছিল। স্থানীয় জমিদার এবং ধনীদের অর্থায়নে নির্মিত নর্থব্রুক হলের নির্মাণকাজ শেষ হয় ১৮৭৯ সালে। এর নজরকাড়া লাল রঙের কারণে আরেক নাম হয় 'লালকুঠি'। পরে ১৮৮২ সালে টাউন হলটিকে একটি পাবলিক লাইব্রেরিতে রূপান্তর করা হয়, এর নাম ছিল 'নর্থব্রুক হল লাইব্রেরি'। নর্থব্রুক হলটির দু পাশেই বর্তমানে গড়ে উঠেছে দুটি আধুনিক দালান, পেছনে লম্বা ছাউনির নিচে রান্নাবান্নার নিয়মিত আয়োজনের নমুনাও দেখে এলাম। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর একে সংরক্ষিত স্থাপনা ঘোষণা করলেও বিখ্যাত নর্থব্রুক হলকে এখন অনেকটাই অরক্ষিত বলে মনে হয় এর ধুলোপড়া, ঝুলে ঢাকা চেহারার কারণে।

নর্থব্রুক হল থেকে বের হয়ে শ্যামবাজারের মসলার পাইকারি বাজারের মধ্য দিয়ে হেঁটে হেঁটে এক সময় পৌঁছে গেলাম হলুদ-মরিচের গোডাউনের ভিড়ে চাপাপড়া উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত 'রূপলাল হাউসে'। ঢাকার ধনাঢ্য জমিদার রূপলাল দাসের মূল বাড়িটি আসলে আরাতুন নামের একজন আর্মেনীয় ধনকুবেরের কাছ থেকে কিনে নেয়া। পুরনো বাড়ি ভেঙে ফেলে মার্টিন কোম্পানিকে দিয়ে একই স্থানে গড়ে তোলেন এই বিশাল প্রাসাদটি। এক সময় সৌন্দর্যে, জাঁকজমকের দিক থেকে যে রূপলাল হাউস আহসান মঞ্জিলের সঙ্গে পাল্লা দিত, সেই সুরম্য অট্টালিকা আজ দখলদারদের বসত ভূমি! দোতলার কাঠের সিঁড়ি ভগ্নপ্রায়, ওপর এবং নিচ তলার রুমে রুমে দখলদার বাসিন্দারা শতছিন্ন পর্দা ঝুলিয়ে দিব্যি দিন গুজরান করে যাচ্ছে। ফরাশগঞ্জের এই এলাকার পাশেই রয়েছে আরেক সমৃদ্ধ এলাকা, বি. কে. দাস রোড– যেখানে এখনো রাস্তার দুপাশে প্রসন্ন বাবু, আসু বাবু, বসন্ত বাবুদের বাড়িগুলো ঔপনিবেশিক ঢাকার অতীত ঐশ্বর্যের ধ্বংসাবশেষ গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেসব দেখতে দেখতে এক সময় এসে দাঁড়ালাম রেবতীমোহন দাস রোডে অবস্থিত 'সূত্রাপুরের জমিদার বাড়ি' হিসেবে খ্যাত রেবতী বাবুর বাড়ির সামনে! বিশ শতকের গোড়ার দিকে রেবতীমোহন দাস ছিলেন ঢাকার একজন প্রখ্যাত জমিদার, ব্যবসায়ী এবং আলেকজান্দ্রিয়া স্টিম মেশিন প্রেসের (নওয়াবপুর) মালিক। যখন মিটফোর্ড হাসপাতালটি বানানো হয়, তিনি সেখানে অর্থায়ন করেছিলেন। সাদা ধবধবে অপূর্ব স্থাপত্যশৈলীর প্রাসাদোপম তিনতলা 'রেবতী ভবনের' সামনে দৃষ্টিনন্দন করিন্থিয়ান ক্যাপিটালযুক্ত ডাবল হাইট পিলার এবং কারুকার্যখচিত খিলান দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না! তবে ভবনের পুরো সৌন্দর্য দেখার প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে ভবনের একদম সামনেই বেমক্কাভাবে দাঁড় করানো লোহার বিশাল এক কাঠামো, সম্ভবত ফায়ার ব্রিগেডের কোনো স্থাপনার অংশবিশেষ! এই ভবনের প্রাঙ্গণ বর্তমানে সম্ভবত ফায়ার সার্ভিসের গ্যারেজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

সেই 'শাঁখারীবাজার' থেকে এই 'রেবতী ভবন' পর্যন্ত ঘুরে এসে মনটা কেমন যেন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল! আমাদের কত ঐতিহাসিক সম্পদ, কত গর্ব করার মতো নিদর্শন এখনো রয়েছে নিজ দেশ ও বিশ্বের মানুষকে দেখানোর অথচ আমরা নিজেরাই তা অযত্ন আর অবহেলা উদাসীনতায় ধ্বংস করছি। ■

রেবতী ভবন

ব্রাহ্ম সমাজ

রূপলাল হাউস